116

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09 MAR 1995 ... ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

ভর্তি সঙ্কট ॥ এখনি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন

আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রায় সবক্ষেত্রেই চলছে সঙ্কট। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে যে সঙ্কট চলছে, তার যেন কোন শেষ নেই। সমাধানও যেন সোনার হরিণ। শিক্ষার কোন সঙ্কটকে বুঝি আমরা কোন দিন অতিক্রম করে যেতে পারব না। কিন্তু মানুষতো সৃজনশীল প্রাণী। প্রতিকূলতাকে অনুকূলে আনাইতো তার কাজ। রাষ্ট্রীয় কর্মযজ্ঞে ব্যর্থতার স্থান নেই। সাফল্যেই অগ্রগতি। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে বিমূঢ় হতে হয়। যে গতিতে যে ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা স্বাভাবিক, সেই গতিতে তা ঘটছে না। সাফল্য অর্জনের সুরদৃষ্টিও দেখা যায় না। পরিকল্পনায় পর্যন্ত নেই তার ছাপ। গতানুগতিক ধারাতেই চলছে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা। এই লেখায় শিক্ষা সঙ্কটের সাতকাহন বিবৃত করব না, স্থানাভাবে তা সম্ভবও নয়। আলোকপাত করব শুধু উচ্চশিক্ষার স্তরে বিরাজমান ভর্তি সঙ্কট প্রসঙ্গে।

পাঠককুল, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এও সেই পুরনো কাসুন্দি। কিন্তু সমাধান চাইলে, কিছুটা হলেও ঘাটতে হবে বৈকি। একটা তথ্য দিয়েই শুরু করি। কদিন আগের একটা খবর। দেশের ১৩টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজে এ বছর ১৪৫০টি আসনে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী। আগের বছর করেছিল ১৭ হাজার। আসন ছিল ১৩২৫। এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, আসন সংখ্যার তুলনায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩/১৪ গুণ বেশি। এত গেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভর্তি হবার আকাঙ্ক্ষার কথা। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবিটা কি আলাদা কিছু? না, মোটেই তা নয়। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য বিভিন্ন ইউনিটে ১টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছিল ৯ থেকে ১৩ জন শিক্ষার্থী। আসন সংখ্যার ওপর এই যে চাপ দেখা যাচ্ছে, তা কিন্তু নতুন নয়। প্রতিবছর সংবাদপত্রের পাতায় উঠে আসছে এই খবর। সঙ্কট দিন দিন বাড়ছে। তবে এখন যা পরিস্থিতি, তা প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলা যায়।

কারণটাও খুব স্বাভাবিক। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দ্রুতবর্ধিষ্ণু জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার এই চাপ ভর্তির ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য ভিড় করছে, কিন্তু সেই তুলনায় আসন সংখ্যা খুবই কম। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী এবং আসনের আনুপাত বাড়ছে দ্রুত। সরকারের পরিকল্পনার অভাবেই সঙ্কট অসহনীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অথচ শিক্ষা ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হয় বলে ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে। গ্রামের স্কুলগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থার কথা নাইবা তুললাম। উচ্চ শিক্ষার স্তরে ভর্তির যে সঙ্কট দেখছি তা থেকেও আঁচ করা যায় এই ঘোষণা কতটা ফাঁকাবুলি হয়ে আছে। বাস্তবে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন নেই।

দেশে উচ্চ শিক্ষার দুটি স্তর আছে— সাধারণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক বা পেশাভিত্তিক। সাধারণ শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিগ্রী কলেজগুলো। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাও অর্জন করা যায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সামান্য কিছু কলেজ থেকে। কারিগরি বা পেশাভিত্তিক শিক্ষা দিয়ে থাকে কৃষি, প্রকৌশল, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো। দেশে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭ (সরকারী ১১, বেসরকারী ৬), মেডিক্যাল কলেজ ১৭ (সরকারী ১৩, বেসরকারী ৪), ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৪, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ১৮, ডিগ্রি কলেজ ২০৮। ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কিছু ডিগ্রী কলেজে অনার্স ও এমএ/এমএসসি পড়ার সুযোগ রয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তেমন নেই বললেই চলে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আসন সংখ্যাও কম। ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা দেশের সাধারণ, প্রকৌশল, কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে ভর্তি হতে চায়। এই প্রবণতাও স্বাভাবিক। অথচ আসন সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় এত কম যে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রায় অসম্ভব এক ব্যাপার। দেশে ভর্তি হওয়া যায় এরকম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ডিগ্রী কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, কারিগরি ইনস্টিটিউট, কৃষি কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ সব মিলিয়ে আসন সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজারের মতো। অথচ গত এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৪৫ জন। ৬০ হাজারের মতো শিক্ষার্থী কোন-না-কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেলেও ১ লাখ শিক্ষার্থী কোথাও পড়ার সুযোগ পাবে না।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার, সবারই লক্ষ্য থাকে ভাল সাবজেক্ট নিয়ে পড়ার। আকাঙ্ক্ষা থাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিষয়ে পড়ার। আগ্রহ থাকে অন্য কোন-না-কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের। কেননা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার সেটাই চাবিকাঠি। কিন্তু ধন্য আশা কুহকিনী। ভর্তির দৌড়ে ছিটকে পড়তে হয় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে। গত বছর যুরেটে ৫৬০ আসনে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল ৪৭ হাজার শিক্ষার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৭২৭ আসনের জন্য ৪৭ হাজার। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ হাজার ১০ আসনে ভর্তির জন্য ৩০ হাজার। জাহাঙ্গীরনগরে ১ হাজার আসনের বিপরীতে ২৫ হাজার। কি ভয়াবহ এই ছবি! কিন্তু কেন এমন হলো? বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়ে উচ্চ শিক্ষাকে কিভাবে সম্প্রসারিত করা যায়, অগ্রসর হয়নি। দিনে দিনে যে এই সমস্যা বাড়তে পারে, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাবিদদের মাথায় তা আসেনি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি এখানে যে, তা ভবিষ্যতমুখী নয়। দূরদৃষ্টি নিয়ে তেবে দেখা হয় না। এই মুহূর্তে কি করা উচিত, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি। স্বাধীনতার ২৫ বছরে তাই দুঃখজনক হলেও সরকারী উদ্যোগে নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৩টি। স্বাধীনতার আগে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল ৮, এখন সীমিত আসন নিয়ে সেই সংখ্যা মাত্র ১৩। কৃষিনির্ভর দেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ১টি। সময়ের বিবর্তনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে শিক্ষার্থীদের। ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে কয়েকগুণ, অথচ ভর্তি হওয়া যায় তেমন প্রতিষ্ঠান নেই। এই পরিস্থিতিতে কোন সন্দেহ নেই— দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়া উচিত ছিল। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান চাহিদা বা সঙ্কটকে মোকাবিলা করা যেত। অর্থাৎ নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবীদের তৈরি করার জন্য বিশেষ বিষয়ের কলেজ/ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ছিল জরুরী করণীয়। এজন্য স্বাধীনতার পর প্রতিবছর দেশে গড়ে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন ছিল। তা হলে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াত ৩০/৩২টি। না, এ কোন অসম্ভব কল্পনা নয়। যেমন পাকিস্তানের কথাই ধরা যাক, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল আমাদের মতোই— ৬টি। এখন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩০টি। প্রতিবেশী ভারতেও এই একই হারে বেড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। আমাদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এত কম যে, প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী ভারতে পড়তে চলে যায়। এতে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে কষ্টার্জিত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। সঙ্গতি থাকলে, সুযোগ পেলে যে কেউ বিদেশে পড়তে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের যদি দূরদৃষ্টি থাকত তা হলে এই প্রবণতা বন্ধের কার্যকর উপায় বের করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। দেশে প্রতিবছর প্রতিবেশী দেশগুলোর মতো ক্রমবর্ধমান হারে বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেই হতো। এমনকি যে বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে যাচ্ছে আজ দেশ থেকে, তা বন্ধের জন্য এখনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা যায়। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও এই মুহূর্তে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছুঁয়ে আছে বলে যে পরিসংখ্যান তনছি, তা কাজে লাগাবার এটাইতো শ্রেষ্ঠ সময়। ব্যাংকে জমা রেখে কি লাভ। অথচ দুঃখজনক হলো, উচ্চ শিক্ষার এই সঙ্কট মোচনে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে, বোঝাই যায় না। এজন্যই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অপারগতা প্রকাশ করায় ৩৬টি কলেজে তড়িঘড়ি করে মাস্টার্স খুলে দেয়া হলো। সংখ্যাটা শুনতে অনেক বড় মনে হলেও একটি কলেজে হয়ত একটি বা দুটি বিষয়ে মাস্টার্স খোলা হয়েছে। অন্য কোন কলেজে হয়ত বিষয়টা নেই। এতে যে একটি বিষয়ে হাতেগোনা কিছু শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এতে অপেক্ষমাণ ৫৬ হাজার পাশ করা ডিগ্রী শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মিটবে না। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক আছে-কি নেই, ক্লাসরুম আছে কি নেই, ল্যাবরেটরির সুযোগ কতটা, খতিয়ে দেখা হয়নি সেসব। বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স তুলে দেবে, সুতরাং এই মুহূর্তে চালু কর মাস্টার্স। এ যেন "ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে"। এই উদ্যোগে কোন পরিকল্পনার ছাপ নেই। আছে কেবলই দায়সারা। কলেজগুলোও তাদের অভিভাবক মন্ত্রণালয়ের চাপে অনুরোধে ঢেঁকি গিলেছে। এতে সঙ্কটের প্রকৃত নিরসন হবে না। আশু সমস্যা সমাধানের জন্য তাই যেমন দরকার স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা, তেমনি আগামীতে যা ঘটবে তার জন্য চাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।

সঙ্কটমুক্তির প্রথম কার্যকর পথ হচ্ছে দেশে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা। কোন্ ক্ষেত্রে কত চাহিদা, সমস্যা কত তীব্র তা চিহ্নিত করে দু/এক বছরের মধ্যে ৩/৪টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া উচিত। আগামী দশ বছরে সাধারণ/কারিগরি/বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫/৬ গুণ হওয়া দরকার। পাকিস্তানে যদি এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৩০, তাহলে ২০০৫ সাল নাগাদ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৫/৪০টি হওয়া নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়।

দ্বিতীয়ত কলেজগুলোতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা খুবই জরুরী। অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে এই সম্প্রসারণ ঘটানো খুব কঠিন নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রাপ্তির ওপর, গবেষণাগারের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে বেশি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ বা এমফিল, পিএইচডি করিয়ে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করার কাজটি এখনই শুরু হতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাও আছে, কিন্তু কেন যে তা শুরু হচ্ছে না, বোঝা কঠিন। মাস্টার্সের পাশাপাশি চালু করা উচিত অনার্স, সম্ভাব্য সব বিষয়ে, সম্ভাব্য সব কলেজে।

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডাবল শিফট চালু করেও ভর্তির চাপ কিছুটা কমানো যায়। প্রকৃতপক্ষে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান গবেষণাগারের কিছু ক্লাস ছাড়া বিকালের দিকে তেমন ক্লাসই হয় না। সাধারণ বিষয়ে ডাবল শিফট চালু করা যায় এখনই। আর অবকাঠামো হিসাবে শুধু শিক্ষক নিয়োগ করলেই এই শিফট চালু করা সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই এরকম একটা উদ্যোগ নিতে পারে এ মুহূর্তে। কলাভবন দুপুরের পর তো অব্যবহৃত, নিঝুম থাকে। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পর্যন্ত কিছুদিন আগে বলেছিলেন, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু শিক্ষক সংখ্যা বাড়িয়ে ডাবল শিফট চালু করা যায়। কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ডাবল শিফট চালু করা সম্ভব, তা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন পারবে না? কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তেবে দেখবে আশা করি।

প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি সঙ্কট মোকাবিলার জন্য দরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। এজন্য সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সরকারী ডিগ্রী কলেজে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডাবল শিফট চালু, বেসরকারী উদ্যোগকে আরও উৎসাহিত করা দরকার। সঙ্কট ইতোমধ্যে নাগালের বাইরে চলে গেছে, এখনি উদ্যোগ না নিলে সমাধানের কোন পথই আর খোলা থাকবে না। সরকার সুনির্দিষ্ট কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসবে— বর্তমান ও আগামী দিনের হাজার হাজার শিক্ষার্থী এবং উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত অভিভাবকদের সেটাই আশা।

মাসুদুজ্জামান